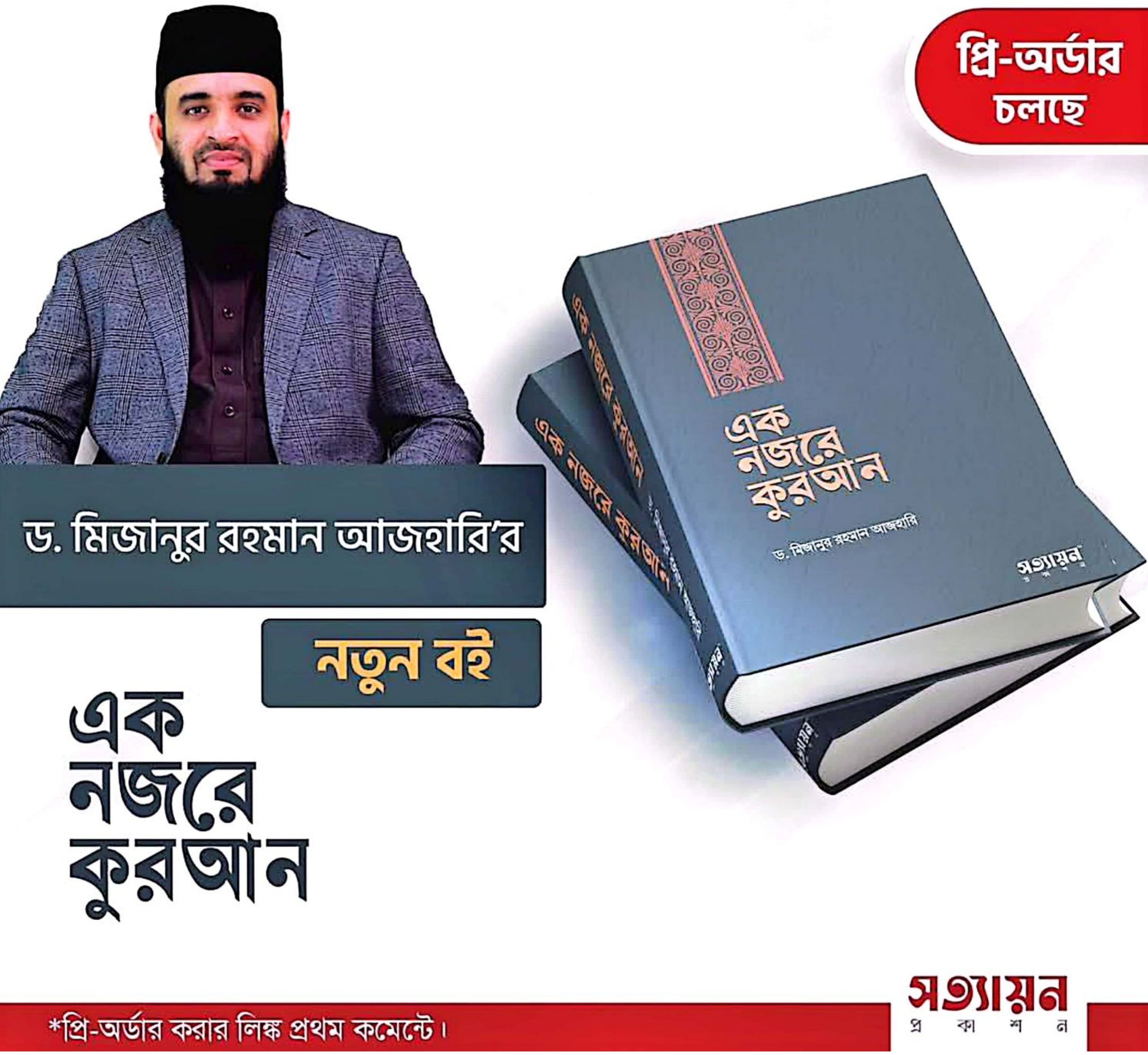
প্রি-অর্ডার চলছে
ড. মিজানুর রহমান আজহারি'র
নতুন বই
এক নজরে কুরআন
এক নজরে কুরআন
ড. মিজানুর রহমান আজহারি
সত্যায়ন
সত্যায়ন প্রকাশন
*প্রি-অর্ডার করার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে।

সূরা ফাতিহা سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫ম সূরা। এর আগে সূরা মুদ্দাসসির ও পরে সূরা লাহাব নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি একেবারে পয়লা সূরা। শুরুতে আনার কারণ, এ সূরাতে অল্পকথায় তুলে ধরা হয়েছে পুরো কুরআনের নির্যাস বা সারকথা।

এক নজরে ফাতিহা

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ০১
- আয়াত: ০৭
- মাক্কি

ফাতিহাতুল কিতাব | উম্মুল কুরআন | আস-সাবউল মাসানি

নামের রহস্য

'ফাতিহা' মানে 'শুরু; সূচনা; ভূমিকা'। সূরা ফাতিহার তিনটি নাম আছে: (১) **ফাতিহাতুল কিতাব** বা কুরআনের সূচনা। কেননা, কুরআন মাজীদ শুরুই হয়েছে এ-সূরা দিয়ে। (২) **উম্মুল কুরআন** বা কুরআনের মূল। কেননা, গোটা কুরআনের মূল ম্যাসেজ এতে অল্পকথায় জায়গা পেয়েছে। আর (৩) **আস-সাবউল মাসানি** বা বারবার-পাঠ-করার সাতটি আয়াত। কেননা, সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত আছে—যেগুলো প্রতি নামাজে বারবার পড়তে হয়।

(দেখুন—তিরমিযি, ৩১২৪; বাগাবি, তাফসীর, ১/৭০; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১৪৫)

মেজর থিম

- ০১ আল্লাহকে চেনা। তাঁর প্রশংসা ও বড়ত্ব ঘোষণা করা।
- ০২ কেবল তাঁরই গোলামি করা। তাঁর দুয়ারেই হাত পাতা।
- ০৩ দিন-রাত তাঁর কাছে সঠিক পথের দিশা চাওয়া।

৩ সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে রব হিসেবে আল্লাহ তাঁর কাজ বা দায়িত্বের কথা জানিয়েছেন। সেটা হলো—বিশ্ব-জগৎ পরিচালনা করা ও বান্দার প্রয়োজন মেটানো। আর শেষে 'আবদ' বা বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তা হলো—কেবল তাঁরই দাসত্ব করা।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা ফাতিহার সম্পর্ক বিশেষ কোনো সূরার সঙ্গে নয়। বরং কুরআনের সবগুলো সূরার সঙ্গেই এর কিছু-না-কিছু সম্পর্ক আছে। মূলত, সূরা ফাতিহার পর বাকি যে ১১৩টি সূরা, সেগুলো সূরা ফাতিহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এজন্যই নামাজে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়তে হয়।

শানে নুযুল

কুরআন কিন্তু গতানুগতিক কোনো বই নয়। কুরআন হলো জীবন-যাপনের প্রেসক্রিপশন। মানুষের একেক দরকারে নেমে এসেছে এর একেক সূরা। তো কোন দরকারে, কী প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে একেকটা আয়াত—তার দলিল-দস্তাবেজকেই বলে শানে নুযুল। প্রায় সবগুলো বিশুদ্ধ তাফসীর ঘেঁটেও সূরা ফাতিহার এরকম কোনো শানে নুযুলের সন্ধান মেলেনি। বোঝাই যাচ্ছে—সূরা ফাতিহা বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য নিয়ে নাযিল হয়নি। ওটা বরং মহান রবের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিস্ময়কর উপহার। তবে হ্যাঁ, সূরা ফাতিহা যখন নাযিল হয়, তখনকার মক্কার চাল-চিত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে কিছু ব্যাপার বুঝতে পারা যায়। যেমন: তখন পবিত্র কা'বা-ঘরের আশপাশে বিস্তর মূর্তিপূজা হতো। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ শুনিয়ে দিলেন তাওহীদের মর্মস্পর্শী ঘোষণা—আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত চলবে না। মূর্তি তো দূরে থাক, অন্য কোনো বিশ্বাস বা মতবাদেরও পূজা করা যাবে না। আবার, ইসলামের ছায়াতলে আসায় তখনকার মুশরিকরা মুসলিমদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ শোনালেন সান্ত্বনার বাণী—একটু সবুর করো। বিচার-দিনে যার যা পাওনা, সব মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর শেষমেশ সরল পথ চাইতে বলার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাতিকে তিনি গেঁথে দিলেন একই সুতোয়। আমাদের তাই একটাই পরিচয়—প্রত্যেকে সরল পথের অনুসারী, ঐক্যবদ্ধ এক জাতি।

(দেখুন—সূরা নাহল, ১৬:৮৯; বুখারি, ৫০০৬; মুসলিম, ৮০৬, ১৭১৫, ২৫৮৬)

সেগমেন্ট

আল্লাহ

প্রথম অংশে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লাহ ও বান্দা

মাঝের অংশে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে চুক্তি—তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বান্দা

আর শেষ অংশে তুলে ধরেছেন বান্দার পরিচয়।

ফজিলত

কুরআনের সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ সূরা: নবিজি এক সাহাবিকে বললেন: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْآنِ "আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত একটি সূরা শেখাব। সেই সূরাটি হলো সূরাতুল ফাতিহা।" (বুখারি, ৪৪৭৪)

রোগের চিকিৎসা: রাসূল ﷺ বলেন: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ سُمٍّ "সূরা ফাতিহা সমস্ত রোগের চিকিৎসা।" (ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১৪৬)

উজ্জ্বল আলো: একবার জিবরীল ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলেন নবিজি। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। এ দরজাটি এর আগে কখনো খোলা হয়নি। তখন ওটা দিয়ে নেমে এলেন এক ফেরেশতা। নবিজিকে সালাম দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর নবি, দুটো আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যে-আলো-দুটো শুধু আপনাকেই দেওয়া হয়েছে, আপনার আগের কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি। একটি হলো সূরা ফাতিহা। আর অন্যটি সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত। ওখান থেকে একটি হরফ পাঠ করলেও বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। (মুসলিম, ৮০৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

বিশ্ব-জগৎ নিয়ে আপনি যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন;	আল্লাহ তাআলাকে তত বেশি চিনতে পারবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা: সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সঠিক পথ ও সফলতা চাওয়া

১. আল্লাহর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি
আল্লাহ—বিশ্ব-জগতের অধিপতি; রাজাধিরাজ। এই বিশেষণ শুধু তাঁর বেলাতেই সাজে। তবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তিনি তাঁর বান্দাদের বেলায় ভীষণ দয়াবান। প্রশংসা কেবল তাঁরই।

২. বিচার দিবসের সত্যায়ন
একমাত্র আল্লাহই এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের আলো-বাতাস-পানি জুগিয়ে যাচ্ছেন। আর তিনিই কিয়ামাতের দিন বান্দার সকল কাজের হিসেব বুঝে নেবেন।

৩. দাসত্বের ঘোষণা ও সাহায্য প্রার্থনা
মহামহিম এই রবের সামনেই কেবল মানুষ মাথা নোয়াতে পারে। আর সাহায্যও চাইতে পারে শুধু তাঁর কাছেই।

৪. সঠিক পথের দিশা
তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে—তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। সেই সাথে বিপথ থেকে যেন আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

কেইস-স্টাডি

সূরা ফাতিহায় গোটা মানব-জাতিকে তিন দলে ভাগ করা হয়েছে। **১. সঠিকপথ-প্রাপ্ত:** এদের জ্ঞান আছে ও সে-অনুযায়ী কাজও করে—নবি-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ-বান্দাগণ। **২. আল্লাহর গযব-প্রাপ্ত:** জ্ঞান আছে ঠিকই, কিন্তু সে-অনুযায়ী কাজ করে না—ইহুদিরা এ দলের আওতায়। **৩. পথভ্রষ্ট:** এরা টুকটাক ধর্মকর্ম করে, কিন্তু সেটা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। মানে, আমল আছে কিন্তু ইলম নেই। পথভ্রষ্টদের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ খ্রিষ্টানরা।

কুরআনে আল্লাহ অসংখ্য ঘটনার মাধ্যমে বারবার আমাদের সামনে এই তিন দলের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। এখন আমাদের কাজ হলো, সেসব ঘটনা গভীরভাবে ভেবে দেখা। আমাদের মধ্যেও অভিশপ্ত ইহুদিদের স্বভাব ঢুকে পড়ছে কি না, খ্রিষ্টানদের মতো আমরাও ইলম ছাড়াই আমল করে নিজেকে কামেল ভাবছি কি না, এসব খতিয়ে দেখা। অন্যদিকে সঠিক পথের অনুসারী—আমাদের প্রিয় নবি ﷺ, নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও অন্যান্য নবি ﷺ। এ ছাড়াও

সঠিক পথ পেয়েছেন লুকমান ও আসহাফে কাহফের যুবকেরা। তাদের ঘটনাগুলো নিয়েও নিবিড় গবেষণা করে দেখতে হবে—আদতে আমরা কতটুকু তাদের অনুসারী হতে পারলাম।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১৭৬; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২১৫)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর নামে শুরু না-করলে, কোনো কাজই পূর্ণতা পায় না।	১	যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক। তাই তাঁর কাছেই সঠিক পথের দিশা চাইতে হবে।	৬
জগতে যত প্রশংসা-বাক্য আছে; সব, সবটুকু আল্লাহর জন্য—যিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-জগৎ।	২	অনুসরণ করা চাই পূর্বসূরিদের—যারা সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন।	৭
সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাঁর অফুরান ভালোবাসা।	৩	জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা বিপথে গেছে—তথা ইহুদিরা—তাদের অনুসরণ নয়।	৭
ভালোবাসেন বলে বান্দা যাচ্ছেতাই করবে—তা নয়। বিচার দিনে অন্যায় কাজের শাস্তিও দেবেন তিনি।	৪	আর জ্ঞান না-থাকার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে—তথা খ্রিষ্টানরা—ওদেরও অনুসরণ নয়।	৭
তাঁকে রব হিসেবে চেনার পর প্রথম কাজ—তাঁর দাসত্ব করা।	৫		

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

'বিসমিল্লাহ'—কথাটি শুনতে খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল। এটা আপনাকে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করিয়ে দেয়। কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মানে—কাজটি এখন আর আপনার একার নয়। বরং আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন আল্লাহ নিজেই। তখন বসে না থেকে এগিয়ে আসবেন ফেরেশতারাও। এখানেই শেষ নয়, বিশ্ব-জগতের সবকিছু আপনার কাজটি বেগবান করতে হয়ে উঠবে তৎপর। এ ছাড়া বিসমিল্লাহ বলে কোনো সাধারণ দুনিয়াবি কাজ শুরু করলেও, তা নেক আমলের খাতায় জমা হতে থাকবে।

(দেখুন—নববি, আল-আযকার, ১৪৩)

সূরা ফাতিহা আমাদেরকে দুআর আদব শেখায়। বান্দা যখন দুআ করবে, তখন শুরুতে তার দয়ালু রব ও মালিকের প্রশংসা করবে। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ধরে ডেকে ডেকে তাঁর কাছে চাইবে। তাঁকে ডাকবে ভয় আর আশা নিয়ে। দুআতে শুধু ভালো বিষয়গুলোই চাইবে না; মন্দ জিনিস থেকে মুক্তি পাবার জন্যও দুআ করবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২০৮)

সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে 'সঠিক পথ' চাইতে বলা হয়েছে। এখন, সঠিক পথ মানেটা কী আসলে? সহজ উত্তর—ইসলাম। কিন্তু এর অন্য একটি দিকও আছে। 'সঠিক পথ' মানে—সকল ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। ধরুন, আপনি একটা কিছু করতে গিয়ে বেশ খটকায় পড়ে গেছেন। কাজটা করা ঠিক হবে কি হবে না। ভাবতে ভাবতে দিশেহারা। ওই সময় 'اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ/আমাকে সঠিক পথ দেখাও' এই ছোট্ট দুআটিই আপনার জন্য আঁধার রাতে মশাল হয়ে হাজির হবে। আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন—কাজটা করা আদৌ ঠিক হচ্ছে কি না। তাই যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার হলেও পড়ে নিন—সূরা ফাতিহা।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১৭৪)

'আল্লাহ' শব্দটি এসেছে إِلٰهٌ/ইলাহ থেকে। ইলাহ মানে এমন এক সত্তা—যাঁর দাসত্ব করে সবকিছু এবং যাঁর ইবাদাত করে সমস্ত সৃষ্টি। (هُوَ الَّذِيْ يَأْلَهُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ)। (দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১২১)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

আল্লাহ اللّٰه

রহমান الرَّحْمٰن

'রহমান' ও 'রহীম' দুটো শব্দই 'রেহেম' থেকে এসেছে। রেহেম মানে মায়ের গর্ভ। মা তার গর্ভে ধরেন বলেই সন্তানকে এত ভালোবাসেন। সেখান থেকেই শব্দ দুটোর অর্থ—'দয়া, করুণা, ভালোবাসা'। তবে 'রহমান' বলতে সাধারণ অর্থে ভালোবাসা বোঝায়—যেটা ক্ষণস্থায়ী ও সকল সৃষ্টির জন্য। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁ বলেন: আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামটি এই দুনিয়ার বেলায় প্রযোজ্য। তার মানে, দুনিয়াতে তিনি কাউকেই তাঁর করুণা থেকে দূরে ঠেলে দেন না। একজন মুমিনকে যেমন রিযিক দেন—বাতাস, অক্সিজেন, খাবার বা পানি—একজন কাফিরকেও তিনি এসব নিয়ামাত ভোগ করবার সুযোগ দেন। কিন্তু পরকালে তিনি তাঁর 'রহমান' গুণটি প্রকাশ করবেন না। মানে, অবাধ্য কাফির-মুশরিকদের জন্য সেদিন তাঁর কোনো দয়া বা ভালোবাসার ছিটেফোঁটা থাকবে না।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ২৭-২৮)

রহীম الرَّحِيْم

'রহীম' বলতে বিশেষ রকমের ভালোবাসা বোঝায়—যেটা চিরস্থায়ী ও কেবল মুমিন বান্দার জন্য। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁ বলেন: আল্লাহ তাআলার 'রহীম' নামটি পরকালের বেলায় প্রযোজ্য। তার মানে, পরকালে কেবল মুমিন বান্দারাই তাঁর করুণা ও ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হবেন। (দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ২৭-২৮)

ইবাদাত عِبَادَةٌ

ইবাদাত মানে আনুগত্য করা। শুধু আনুগত্য নয়, বরং অতি বিনয় ও ভক্তির সাথে আনুগত্য। আল্লাহ যা করতে বলবেন, বিনাবাক্যে তা মেনে নেওয়াকেই সত্যিকারের ইবাদাত বলে। (দেখুন—নাহহাস, মাআনিল কুরআন, ১/১০)

সূরা বাকারা

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৭-তম সূরা। এর আগে সূরা মুতাফফিফীন ও পরে সূরা আনফাল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২য় সূরা। এর আগে আছে সূরা ফাতিহা ও পরে সূরা আলে ইমরান।

এক নজরে বাকারা

- মাদানি যুগের ১ম সূরা
- সূরা নং: ০২
- আয়াত: ২৮৬
- মাদানি

নামের রহস্য

'বাকারা' মানে 'গাভি'। বনী ইসরাঈলের এক লোক খুন হলো। বিবাদ মেটাতে তারা মুসা ﷺ-এর কাছে গেল। মুসা ﷺ বললেন—এক কাজ করো, একটা গাভি জবাই করো। তারপর ওটার একটা অংশ দিয়ে খুন-হওয়া লোকটির গায়ে সামান্য বাড়ি দাও। দেখবে সে দিব্যি জীবিত হয়ে খুনির নাম বলে দিচ্ছে। কিন্তু বনী ইসরাঈল বলে কথা! এরকম একটা সহজ হুকুমকেও তারা প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন করে জটিল করে তুলল! এ-সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নং আয়াতে সেই ঘটনাই জায়গা পেয়েছে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'বাকারা'।

মেজর থিম

০১ সঠিক পথের সন্ধান। ইতিহাসের শিক্ষা।

০২ পারিবারিক ও সামাজিক আইন।

০৩ মুসলিম সমাজে ঐক্য। ভালো কাজে উৎসাহ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই একজন খাঁটি মুমিনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: খাঁটি মুমিন তো সে, যে ঈমান আনে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর। আর সূরার শেষে এসে 'গায়েব' তথা অদৃশ্য বিষয় কোনগুলো, তা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গায়েব মানে: আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসূল, পুলসিরাত, মীযান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা ফাতিহার শেষ দিকে, বান্দা তার রবের কাছে সঠিক পথের দিশা চেয়েছে। আর এ-সূরায় রব তাঁর বান্দাকে সঠিক পথের দিশা জানিয়েছেন। এ-সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে: কুরআন—এমন এক কিতাব—যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

শানে নুযুল

হিজরত করে মদীনায় এলেন নবিজি। মদীনার অ-দূরেই ইহুদিদের বসতি। ইহুদিরা নিজেদেরকে তাওরাতের অনুসারী দাবি করত। ফলে ইসলাম, রাসূল বা আসমানি কিতাব—এগুলো সম্পর্কে ওদের ভালোই জানাশোনা। সেই হিসেবে আশা ছিল—নবিজি মদীনায় ঠাঁই নেওয়া-মাত্রই, ইসলাম কবুল করবে ইহুদিরা। কিন্তু তা ঘটল না, ঘটল ঠিক উলটোটা। ইহুদিরা নবিজিকে চিনেও, না চেনার ভান করল, সত্য মেনে নিতে রাজি হলো না। কারণ কী? ইহুদিরা আসলে তাওরাত অনুসরণ করত নামকাওয়াস্তে। তাওরাতের যেসব বিধান ওদের রুচি-মতো হতো না, সেগুলো ওরা বদলে ফেলত। নিজেরা নিজেরা আইন বানাত, আর সুযোগ বুঝে তা 'আল্লাহর বিধান' বলে চালিয়ে দিত। সুদ, যিনা, মিথ্যা কথা—এসব ছিল ওদের কাছে ডালভাত। তো, ওরা যখন দেখল, নবিজির অনুসরণ করলে পাপের দরজায় খিল পড়বে, খায়েশ-মতো আর কুকর্ম করা যাবে না, তখনই ওরা বেঁকে বসল। আল্লাহ তখন এ-সূরার বেশ অনেকগুলো আয়াত ওদের সম্বোধন করে নাযিল করলেন। ঝকঝকে আয়নার মতো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হলো ইহুদিদের সত্যিকার ইতিহাস। আল্লাহ ওদেরকে জানিয়ে দিলেন—তোমরা যে নিজেদেরকে তাওরাতের অনুসারী দাবি করছো, তা মোটেও সত্য নয়। এই যে তোমাদের ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ। আবার সে-সময়টায় মদীনাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল মুনাফিকরা। তাদেরকে নিয়েও আলোচনা হলো বিস্তর। তা ছাড়া মদীনা ততদিনে একটি ছোটখাটো ইসলামি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র চালাতে আইন লাগে। এই সূরার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সেই আইন পাঠানো হলো। নাগরিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি—ইত্যাদি ব্যাপারে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আইনি রূপরেখা কেমন হবে, তার খুঁটিনাটি আলাপ নিয়েই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২৩৯; বাগাবি, তাফসীর, ১/১৮০; যামাখশারি, আল-কাশশাফ, ১/৫৩৩)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কঠিন সময়ে যত ধৈর্য ধরা আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া যাবে; → আল্লাহর সাহায্যও তত তাড়াতাড়ি নেমে আসবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
বনী ইসরাঈলের হাত থেকে বনী ইসমাঈলের হাতে নেতৃত্বের পরিবর্তন।

১. আল্লাহর প্রতিনিধি
মানুষকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আইন কার্যকর করাই হলো মানুষের প্রধান দায়িত্ব।

২. বনী ইসরাঈলের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও শিক্ষা
সময়ের ধারাবাহিকতায় বনী ইসরাঈলের ওপরও সেই একই দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলে।

৩. স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলিমদের উত্থান
পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের এই দায়িত্ব আল্লাহ বনী ইসমাঈল অর্থাৎ মুসলিম-জাতিকে দিলেন। নেতৃত্বের পালাবদলের দৃষ্টান্ত হিসেবে মুসলিমদের জন্য কিবলার দিক পরিবর্তন করে দিলেন তিনি।

৪. আইন ও নৈতিকতা
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো নৈতিকতা। তাই মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ঠিক করে দিলেন—ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ পরিচালনার ফ্রেমওয়ার্ক। প্রণয়ন করলেন ইসলামের বেশকিছু মৌলিক বিধান।

কেইস-স্টাডি

ইহুদিরা বাইতুল মাকদিসকে কিবলা মানে। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য আলাদা কিবলা ঠিক করে দিলেন। সেটা হলো—পবিত্র কা'বা। এরকম বহু ঘটনা আছে যেখানে দেখা যায়—ইহুদিরা যা যা করত, নবিজি মুসলিমদেরকে তার চেয়ে ভিন্নটা করতে বলতেন। ইহুদিদের অভ্যেস, রীতি-রেওয়াজ বা সংস্কৃতির সাথে মুসলিমদের একচুলও মিল থাকুক, নবিজি তা কখনো চাইতেন না। এ কারণেই মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তো, কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনায়, শহুরে-শিক্ষিত কিছু বাঙালি-মুসলমানের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। বাঙালিয়ানার নামে তারা যে দিন দিন কলকাতাই কৃষ্টি-কালচার লুফে নিচ্ছে, এটা এক ভয়ের কথা। 'শিক্ষিত' এই মানুষগুলো কি তাদের নিজস্ব পরিচয় নষ্ট করে দিতে চাইছে, যে পরিচয় তারা পেয়েছে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে? তারা কি নিজেদেরকে মূর্তিপূজারিদের একটা কপি ভার্সন হিসেবে দেখতে চাচ্ছে? তা হলে তারা জেনে রাখুক, কিয়ামাতের দিন তারা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র প্যাঁচা-বানর আর বাঘ-কুমির হাতে করেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। ভিন্ন জাতির পৌত্তলিক সংস্কৃতি প্রমোট করবার অপরাধে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের ওপর সেদিন ভীষণ রেগে থাকবেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৬৫২, ৪০৩১; বুখারি, ৭৩২০; মুসলিম, ২৬৬৯)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুত্তাকীদের গুণাবলি এবং কাফির-মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।	১-২০	ইহুদি-খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো ধর্মের রীতি-রেওয়াজ-সংস্কৃতি মুসলিমরা অনুসরণ করতে পারে না।	১৪২-১৭৭
আদম সৃষ্টির ঘটনা, ইবলিসের প্রতিক্রিয়া এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় দুনিয়ার বুকে মানুষের অবতরণ।	২১-৩৯	ওয়ারিশ বণ্টন, রোযা, হজ্জ, কিসাস ও জিহাদ বিষয়ে বেশকিছু নির্দেশনা এসেছে। দেওয়া হয়েছে প্রকৃত আনুগত্যের পরিচয়।	১৭৮-২০৩
দুনিয়ায় মানব-জাতির ক্রমধারায় বনী ইসরাঈলের আগমন। তাদের লাগাতার অবাধ্যতা ও ফলস্বরূপ লাঞ্ছনার কাহিনি।	৪০-৭৪	সবর করার গুরুত্ব ও পুরস্কার সম্পর্কিত আলোচনা। এসেছে বিয়ে, তালাক ও দুগ্ধপোষ্য-সন্তানের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান।	২০৪-২৪২
শুধু নবিজি নন, ইহুদিরা মুসা ﷺ-এর সাথেও বেয়াদবি করেছে। তাদের সেই অবাধ্যতা ও ষড়যন্ত্র আজও চলমান।	৭৫-১২৩	পুনরুজ্জীবনের দুটি বিস্ময়কর নজির তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শেখানো হয়েছে দান-সাদাকা করার ইসলামি আদব।	২৪৩-২৭৪
ইবরাহীম ﷺ ছিলেন সঠিক পথের দিশারি। তিনি মুসলিমদের অনুসরণীয় আদর্শ। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট।	১২৪-১৪১	সুদের ক্ষতি ও লেনদেনে স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। একটি চমৎকার দুআ দিয়ে সূরার সমাপ্তি।	২৭৫-২৮৬

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরা ফাতিহাতে রবের কাছে আমরা সঠিক পথের সন্ধান চেয়েছি। সূরা বাকারায় আমাদের সেই ডাকে আল্লাহ সাড়া দিলেন। দুনিয়ার মানুষকে জানালেন—সঠিক পথের সন্ধান আছে কুরআনে। তবে একটা কথা, কুরআন ঢালাওভাবে সবাইকে সঠিক পথ দেখাবে না। কুরআনের সাথে যার আচরণ যেমন, কুরআনও তাকে ঠিক ততটুকু পথই দেখাবে। যারা কুরআন পড়ে অহংকার নিয়ে, সবজান্তা একটা ভাব নিয়ে, তারা নির্ঘাত সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যারা কুরআন পড়বে বিনয়ের সাথে, হিদায়াত-প্রত্যাশী হয়ে—কুরআন তার জন্য আলো ঝলমলে হয়ে উঠবে। ঠিক এজন্যই এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে: কুরআন পথ দেখায় মুত্তাকীদের।

(দেখুন—ইবনু হিব্বান, ১২৪; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১৮৫৫)

মানুষ-মাত্রই ভুল করবে, পা পিছলাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল করবার পরে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, সেটাই দেখবার বিষয়। সেটাই প্রমাণ করবে রবের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। এই ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যই, আদম ﷺ-এর ঘটনা সূরা বাকারার গোড়াতে আনা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা শক্তিশালী রিমাইন্ডার যে—জগতের সেরা মানুষদের দ্বারাও ভুল হয়েছে, তাই আমরাও ভুল করব। কিন্তু ভুল হয়ে যাবার পর তাঁরা গোঁয়ার্তুমি করেননি, ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকেননি। বরং শাস্তির ভয়ে বিনয়ে গলে পড়েছেন। এত এত তাওবা করেছেন যে—তাদের ভুলের চাইতেও তাওবার ওজন অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক বিপরীতে ছিল ইবলিস ও ফিরআউন। তারা খুব জোরের সাথে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সত্যকে চেনার পরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একটাই কারণ—তাদের অন্ধ ঔদ্ধত্য, বিচ্ছিরি অহংকার। ফলে, সঠিক পথ ও তাদের মাঝে, ইস্পাত-কঠিন দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে। আর তাদের সবশেষ ঠিকানাও হয়েছে জাহান্নাম। হ্যাঁ, অহংকারের করুণ পরিণতি এমনই।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৪৯৯; ইবনু মাজাহ, ৪২৫১; মুসলিম, ৯১)

মানুষ সৃষ্টির আগে, আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি দুনিয়াতে খলিফা তথা প্রতিনিধি পাঠাব। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এই 'খলিফা' কথাটির অর্থই আমাদের ঠিকঠাক জানা নেই। গোড়াতেই গলদ! আমরা এখন কাপড়-সেলাই-করা দরজিকে বানিয়েছি খলিফা। গাঁও-গেরামে আবার এলাকার মাতবরগুলোকেও 'খলিফা' ডাকতে দেখা যায়। আফসোস, শত আফসোস। 'খলিফা'-র মতো একটি ওজনদার শব্দকে আমরা এভাবে নষ্ট করে ফেললাম! অথচ খলিফা হলেন— خَلِيفَةٌ لَهُ يَحْكُمُ فِيهَا بَيْنَ خَلْقِهِ بِحُكْمِهِ যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, তাঁরই হুকুম-মতো বিচার-ফায়সালা করবে। এতে বোঝা গেল—আমরা নিজেদেরকে তখনই আল্লাহর 'খলিফা' পরিচয় দিতে পারব, যখন দুনিয়াতে তাঁর হুকুম বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের ভেতর থাকবে। 'খলিফা'র আরেকটি অর্থ রয়েছে: 'দেখভালকারী'। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির কোনোকিছু যেন নষ্ট না হয়, তা দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং সেই ব্যাপারেও আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। (দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/৪৫১)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

খলিফা خَلِيفَةٌ

তাকওয়া تَقْوٰى

'তাকওয়া' কথাটি এসেছে 'তাকী' থেকে। 'তাকী' মানে-নিজেকে বাঁচিয়ে চলে যে। ঘোড়ার খুরের নিচে লোহার একরকমের চাকতি বসানো হয়। ওটাকে বলে 'নাল'। ঘোড়া যখন তুমুল বেগে ছুটে চলে, তখন পায়ের তলায় অনেক-সময় কাঁটা, নুড়ি-পাথর, বরইয়ের আঁটি—এরকম জিনিস পড়তে পারে। আর তাতে ঘোড়ার পায়ের তলা কেটে যায়, কখনো মারাত্মক জখম হয়। কিন্তু লোহার ওই নাল পরানো থাকলে, এরকম কোনো ভয় থাকে না। তো, যখন ঘোড়ার খুরে নাল পরানো থাকে না, খালি থাকে, তখন ওই ঘোড়াকে বলা হয় তাকী। কেননা, ঘোড়াটিকে তখন খুব সাবধানি হয়ে, দেখেশুনে পথ চলতে হয়। আর তাকী থেকেই এসেছে তাকওয়া। তার মানে, মুমিন যখন দুনিয়ায় জীবন-যাপন করবে, তখন ওই নাল-বিহীন ঘোড়ার মতোই সাবধানি হবে। এমনভাবে পথ চলবে যাতে গুনাহের আঁচড় তার অন্তরে না লাগে। এভাবে গুনাহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে, নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার নামই তাকওয়া। (দেখুন—ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, ১৫/৪০৫)